গুজব ও অপতথ্য মোকাবিলায় প্রয়োজন জাতীয় ই-সেফটি পরিকল্পনা

পরীক্ষিৎ চৌধূরী

সম্প্রতি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপনের একটি বক্তব্য সময়ের অন্যতম জরুরি বাস্তবতাকে সামনে এনেছে। এ মাসের শুরুতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ভুয়া খবর, মিসইনফরমেশন ও ডিসইনফরমেশনকে এখন আর সাধারণ সমস্যা হিসেবে ভাবার সুযোগ নেই। ডিজিটাল প্রযুক্তির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এসব তথ্যগত ঝুঁকি ক্রমেই গভীর ও জটিল আকার ধারণ করছে, যা ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্র,সবার জন্যই উদ্বেগের কারণ। মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, এই ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শুধু সমস্যা শনাক্ত বা বিশ্লেষণ করাই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন বাস্তবসম্মত সমাধান, সমন্বিত উদ্যোগ এবং একটি কার্যকর জাতীয় কর্মপরিকল্পনা। এ লক্ষ্যে তিনি বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রতি সময়োপযোগী, বাস্তবভিত্তিক এবং কার্যকর একটি ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান বা ই-সেফটি প্ল্যানের খসড়া প্রণয়ন করে সরকারের কাছে উপস্থাপনের আহ্বান জানান।

বেশ কিছুদিন ধরে ‘ফেইক নিউজ’ বা ভুয়া খবর সমাজের সর্বস্তরে উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠছে। গুজব ও বিভ্রান্তিকর তথ্য কীভাবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি করছে এবং তা নিয়ন্ত্রণে কী করা উচিত,এ নিয়ে জনমনে ব্যাপক আলোচনা চলছে। সাংবাদিক, সুশীল সমাজ ও অধিকারকর্মীরা সতর্ক করে আসছেন যে অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ভুল তথ্যের শিকার হন সাধারণ মানুষ, যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব হতে পারে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

ভুয়া খবর ও গুজব জনমতকে বিভক্ত করে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এটি বিদ্বেষমূলক বক্তব্যও উগ্রবাদকে উসকে দেয়, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি মানুষের আস্থা দুর্বল করে। এদিকে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থে ভুয়া তথ্য প্রচারের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যবহারকারীদের প্রতিবাদ ও ক্ষোভও ক্রমেই বাড়ছে। ফলে ভুয়া খবর প্রতিরোধ এখন শুধু তথ্যগত নয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে।

তবে বাস্তবতা হলো, ভুয়া খবরের বিস্তার কমার পরিবর্তে ক্রমেই বাড়ছে এবং নতুন নতুন কৌশলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এর কারণ বুঝতে হলে মিসইনফরমেশন, ডিসইনফরমেশন ও ম্যালইনফরমেশন সম্পর্কে সংক্ষেপে জানা প্রয়োজন। মিসইনফরমেশন হলো অনিচ্ছাকৃতভাবে ছড়িয়ে পড়া ভুল তথ্য, আর ডিসইনফরমেশন হলো ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি ও প্রচারিত ভুয়া তথ্য, যার উদ্দেশ্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি বা জনমত প্রভাবিত করা। অন্যদিকে ম্যালইনফরমেশন বলতে সত্য বা আংশিক সত্য তথ্যকে প্রসঙ্গ বিকৃত করে উপস্থাপন করাকে বোঝায়, যাতে ভুল ধারণা তৈরি হয়।

বর্তমানে ভুয়া ফটোকার্ডও একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। সহজলভ্য ডিজিটাল টুলস ব্যবহার করে মূলধারার গণমাধ্যমের আদলে তৈরি এসব ভুয়া সংবাদ কার্ড দ্রুত মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতির ফলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় অপতথ্যও সহজেই ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে। ভুয়া খবর দ্রুত বিস্তারের অন্যতম কারণ হলো ‘কনফার্মেশন বায়াস’। মানুষ সাধারণত নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য সহজে গ্রহণ ও যাচাই ছাড়াই শেয়ার করে। ভয়, রাগ বা ঘৃণার মতো আবেগও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যালগরিদম বেশি প্রতিক্রিয়াপ্রাপ্ত কনটেন্টকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়, যা ভুয়া তথ্যের বিস্তারকে ত্বরান্বিত করে।

এ ছাড়া বেশি ভিউ, ট্রাফিক ও বিজ্ঞাপন আয়ের আশায় অনেক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ইচ্ছাকৃতভাবে অতিরঞ্জিত বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশ করে। ক্লিকবেইট শিরোনাম ও আকর্ষণীয় ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট মানুষের কৌতূহল বাড়িয়ে এসব তথ্যকে আরও দ্রুত ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করে।

ভুয়া তথ্যের বিস্তারের আরেকটি বড়ো কারণ হলো সাধারণ মানুষের ডিজিটাল সাক্ষরতার ঘাটতি। অনেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের উৎস বা সত্যতা যাচাই না করেই তা বিশ্বাস ও শেয়ার করেন। দ্রুতগতির শেয়ারিং সংস্কৃতির কারণে এক ক্লিকেই তথ্য ছড়িয়ে পড়ে, ফলে যাচাইয়ের সুযোগ সীমিত হয়ে যায়।

এ ছাড়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণাও অপতথ্য বিস্তারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিভিন্ন গোষ্ঠী জনমত প্রভাবিত করা, প্রতিপক্ষকে দুর্বল করা বা সামাজিক বিভাজন তৈরির লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে ভুয়া তথ্য প্রচার করে। একইভাবে হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রামের মতো এনক্রিপ্টেড প্ল্যাটফর্মে ছড়ানো ভুল তথ্য শনাক্ত ও প্রতিরোধ করাও কঠিন। বট ও ভুয়া অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে তথ্য ভাইরাল করার প্রবণতাও উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা জরুরি। ভুয়া তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে প্ল্যাটফর্মগুলোর অ্যালগরিদম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তাই তাদের কার্যক্রমকে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর আওতায় আনা প্রয়োজন। রাষ্ট্রকে উপযুক্ত আইন ও নীতিমালার মাধ্যমে প্ল্যাটফর্মগুলোকে স্থানীয়ভাবে নিবন্ধন, প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এবং ভুয়া কনটেন্ট অপসারণে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে।

এ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডিজিটাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, যা প্ল্যাটফর্মগুলোর দায়বদ্ধতা ও অ্যালগরিদমিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। জার্মানি, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশ ভুয়া খবর মোকাবিলায় কঠোর আইন ও জরিমানার ব্যবস্থা চালু করেছে। অনেক দেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা কমিশনও গঠন করা হয়েছে, যা আইন প্রয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশেও এ ধরনের একটি স্বাধীন ও সক্ষম কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ জানিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি ক্ষতিকর কনটেন্ট দ্রুত অপসারণের লক্ষ্যে সাইবার নিরাপত্তা আইন পুনরায় সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে মেটাসহ বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্ষতিকর কনটেন্ট সরিয়ে ফেলতে বাধ্য করার জন্য সরকার আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করছে।

ভুয়া তথ্য মোকাবিলায় প্ল্যাটফর্মগুলোর অ্যালগরিদমিক স্বচ্ছতা এবং শক্তিশালী কনটেন্ট মডারেশন ব্যবস্থাও জরুরি। বিশেষ করে নির্বাচন, মহামারি বা জাতীয় সংকটের সময় অপতথ্যের বিস্তার রোধে কার্যকর ফিল্টারিং, সতর্কবার্তা ব্যবস্থা, স্থানীয় ভাষাভিত্তিক মডারেটর এবং ফ্যাক্ট-চেকিং সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

এ ক্ষেত্রে ‘প্রি-বাংকিং’ বা পূর্বসতর্কীকরণ একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে। ভুয়া তথ্য ছড়ানোর আগেই মানুষকে সম্ভাব্য বিভ্রান্তিমূলক কৌশল সম্পর্কে সচেতন করা হলে তারা তথ্য যাচাইয়ে আরও সতর্ক হন। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এই পদ্ধতি ইতোমধ্যে সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশেও গুজব ও অপতথ্য প্রতিরোধে তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সমন্বিতভাবে কাজ করছে। তথ্য অধিদফতর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এবং গণযোগাযোগ অধিদপ্তর নিয়মিত সচেতনতামূলক প্রচারণা, তথ্যবিবরণী ও গণসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশের সমন্বয়ে দেশের প্রতিটি জেলায় গুজব প্রতিরোধ সেল গঠন করা হয়েছে, যা মাঠপর্যায়ে অপতথ্য মোকাবিলায় সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

তবে দীর্ঘমেয়াদে ভুয়া খবর প্রতিরোধে শুধু আইন প্রয়োগই যথেষ্ট নয়; মূলধারার গণমাধ্যম, ফ্যাক্ট-চেকিং প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্ম, সরকার এবং নাগরিক সমাজের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমেই একটি নিরাপদ ও দায়িত্বশীল ডিজিটাল পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

ভুয়া তথ্যের বিস্তার রোধে নাগরিকদের মধ্যে ডিজিটাল সাক্ষরতা গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো তথ্য শেয়ার করার আগে তার উৎস, সত্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। চমকপ্রদ শিরোনাম বা আবেগনির্ভর কনটেন্টে প্রভাবিত না হয়ে প্রয়োজনে ফ্যাক্ট-চেকিং প্ল্যাটফর্মের সহায়তা নেওয়া এবং নিশ্চিত না হয়ে কোনো তথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকাই ব্যক্তিপর্যায়ে সবচেয়ে কার্যকর প্রতিরোধ।

এ ক্ষেত্রে কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা কার্যক্রম, স্কুলে ডিজিটাল সাক্ষরতা শিক্ষা এবং জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিত মিডিয়া লিটারেসি ক্যাম্পেইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সরকার, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের যৌথ উদ্যোগ তরুণ প্রজন্মকে তথ্য যাচাইয়ের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবে।

গণমাধ্যমের দায়িত্বও কম নয়। ক্লিকবেইট শিরোনাম পরিহার, তথ্যের উৎস যাচাই, দ্রুত সংশোধনী প্রকাশ এবং স্বাধীন ফ্যাক্ট-চেকিং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার মাধ্যমে তারা গুজব মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। একই সঙ্গে ডিপফেক ও অপতথ্যের মতো নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ফ্যাক্ট-চেকিং প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অংশ করা প্রয়োজন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারকেরা বারবার সতর্ক করেছেন যে অপতথ্য শুধু রাষ্ট্রের নয়, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জন্যও বড়ো হুমকি। তাই ভুয়া খবর প্রতিরোধের এই লড়াই কেবল সরকারের একার নয়; এটি একটি সম্মিলিত দায়িত্ব। সরকারের উদ্যোগ, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, গণমাধ্যমের পেশাদারিত্ব এবং নাগরিকদের সচেতন অংশগ্রহণের সমন্বয়েই গড়ে উঠতে পারে গুজবমুক্ত, নিরাপদ ও দায়িত্বশীল ডিজিটাল সমাজ।

#

লেখক: বিসিএস তথ্য ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা

পিআইডি ফিচার